OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 97 - 105
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 97 - 105
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

জীবনানন্দের কবিতায় দ্বন্দ্ববোধ, অস্তিত্বের বহুরূপতা ও চৈতন্যের উত্তরণ

ড. অচিন্ত্য মাজী
সহকারী অধ্যাপক
চিত্ত মাহাতো মেমোরিয়াল কলেজ, জার্গো, পুরুলিয়া
Email ID : achintamajee12@gmail.com

Received Date 20. 12. 2024
Selection Date 01. 02. 2025

Keyword
কবিতায় দ্বন্দ্ববোধ, চৈতন্যের জাগরণ, অস্তিত্বের বহুমাত্রাকে অন্বেষণ, সত্তার উত্তরণ।

Abstract
জীবনানন্দের কবিতায় দ্বন্দ্ববোধ তাঁর কবিতাকে দিয়েছে অদ্ভুত এক ব্যাপ্তি এবং গভীরতা। তাঁর কবিতার অন্তর্গত দ্বন্দ্বের বিন্যাসে আমরা পাই মানব চৈতন্যের বহুধা বিচ্ছুরণ, মূল্যবোধকে জাগিয়ে রাখার আশ্চর্য আলোকরেখা, বৃহত্তর পৃথিবীর পরিধিতে শাশ্বত মানবকণিকাকে প্রতিস্থাপনের অভিলাষ। সাম্প্রতিকের বিষবাষ্প এবং ক্লেদ প্রতিমুহূর্তে সত্তার ভেতরে নিহিত থাকা নান্দনিক সুষমাকে ধ্বস্ত করে দিচ্ছে। কবি টের পাচ্ছেন অজস্র গরমিলের মাঝে লুকোনো গরল, অস্তিত্বের ভেতরে তার গোপন গ্রাস তছনছ করে দিচ্ছে সমস্ত সামঞ্জস্য। কবির চৈতন্য এই সার্বভৌম আলোড়নে আহত হয়ে দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়েই পেতে চাইছে কোনো স্থিতির ভূমি। কবির অন্বেষণ তাই ধাবিত হয় সাম্প্রতিকের বাস্তবকে আত্মস্থ করে অতীত ও ঐতিহ্যের সরণি বেয়ে স্থবিরতার বিপরীতে মানবতাকে জাগানোর আয়োজনের অভিমুখে। প্রেম ও প্রকৃতিকে সন্ধানের সাধারণ সমীকরণের বাইরে তাঁর বোধ নতুন অঙ্গীকারের অঙ্গারে নিষিক্ত হয়ে ওঠে। এই অন্বেষণের স্পর্শেই জাগ্রত চৈতন্য অপরূপ শান্তির দিকে অগ্রসর হয়। আমাদের আলোচনা দ্বন্দ্বের বিন্যাসে জাত এই চৈতন্যের অন্বেষণের বহুরূপতা ও সত্তার পরিক্রমণের গন্তব্যটি।

Discussion

যেকোনো কবিই কবিতা লেখার মুহূর্তটিতে তীব্র আবেগের সম্মুখীন হন। কবির সেই আবেগের চরমক্ষণে লগ্ন হয়ে থাকে যেমন কবির ভেতর, তাঁর অন্তঃসত্তা তেমনি তাঁর চারপাশও। অর্থাৎ সত্তার গভীরে যে বোধের উৎসার তার জন্ম নিভৃতির মধ্য দিয়ে সূচিত হলেও তাকে ধারণ করে থাকে বাইরের মাটি আলো হাওয়া দেশ সমাজ। ফলতই ব্যক্তিগত যে স্তর থেকে একটি কবিতার প্রসব হয় তা আর শেষপর্যন্ত ব্যক্তিগত থাকে না, মিলে যায় বহুত্বের সমন্বয়ে। এ এক আশ্চর্য সংশ্লেষণ। অনুভূতি আর কল্পনা, দৃষ্টি আর পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা আর আবেগের মিশেলে যা উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে তাকে ছুঁয়ে থাকে

পরম্পরা, ঐতিহ্য তাকে গড়ে তোলে, সংস্কৃতি তাকে পরিণতি দেয়। এভাবে জীবন ও জগৎ থেকেই কবি নিংড়ে নেন কল্পনার আধার ও উৎসকে। স্নায়ুর ভেতর থেকে যে সঞ্চার জারিত হয় তা আসলে জীবন জিজ্ঞাসার গভীর প্রতীতি।

কবিতা লিখতে গিয়ে তাই কবিকে নানা দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়। এ দ্বন্দ্ব যেমন সৃষ্টির তেমনি স্বরের। পরিপার্শ্ব প্রবলভাবে মননকে ধাক্কা দেয়, সত্তাকে প্রশ্নমুখী করে তোলে। সমাজ ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে গড়ে তোলে; আবার জীবন কখনোই বিশেষ ধরাবাঁধা ছকে চলে না। এইদিক থেকে নিরন্তর সংঘর্ষ চলে জীবন ও যাপনের। তাঁর যা কিছু অর্জন, যা কিছু বিকশিত হয়ে ওঠা সবই সমকালে সম্পৃক্ত হয়ে, অন্যদিকে তার ভেতরের গঠনের প্রধান সহায়ক ঐতিহ্য। কখনো কখনো সময় এমনভাবে সমস্তকিছুকে ওলট পালট করে দেয় যে মানুষের চেনা উপলব্ধিগুলি তার নিজস্ব পথে চলতে পারে না। তখনই শুরু হয় দ্বন্দ্ব। সূচিত হয় কল্পনা আর বাস্তবতার বিরাট ফারাক। মনোগহনের অতলেও এই ভাঙচুর চলতে থাকে। কবির অনুভূতি পৌঁছে যায় চারদিকের কোলাহল আর বিপর্যয়ের আড়ালে গভীর গোপন কোনো অলিন্দে। যুগযুগ ধরে চলে আসা রীতি প্রবণতা যখন সাম্প্রতিক আলোড়নের জোয়ারে এলিয়ে পড়ে তখন কবির বিশ্বাসের ভেতরেও অজস্র ঘাত প্রতিঘাত ওঠানামা করতে থাকে। এই স্পন্দন তো আসলে যাপনচিত্রেরই অনবদ্য উন্মোচন পরতে পরতে জড়িয়ে থাকে ইন্দ্রিয়কোষে। জীবনানন্দের কবিতা এই আত্মসংঘর্ষের ফসল, অনুপম প্রদাহ ও জ্বালা নিয়ে, স্থৈর্য আর ভূমা নিয়ে স্বয়ম্ভর হয়ে আছে নাক্ষত্রিক আভায়।

আমরা জীবনানন্দের কবিতায় দ্বন্দ্বের এই বহুকৌণিক মাত্রাটিকে ধরতে প্রয়াসী। এই দ্বন্দ্বের বোধ অস্তিত্বের বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সমকালের সংক্ষুব্ধ কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি প্রায়শই চলে যান চরম নেতির বলয়ে, ক্ষুধা-ক্ষোভ আর অবক্ষয়ের গভীর ধ্বসের ভেতর অথচ তার মাঝেই ধরা থাকে নেতিহীনতার সূক্ষ্ম ধূপছায়া। এই প্রত্যয় চুপিচুপি এগিয়ে চলে চরম বেদনার মাঝে আশ্চর্য সত্য হয়ে। কবির কথায় -

> “আমাকে অনুভব করতে হয়েছে যে খণ্ড বিখণ্ডিত এই পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও এক এক সময় যেন থেমে যায়, - একটি-পৃথিবীর-অন্ধকার ও স্তব্ধতায় একটি মোমের মতন যেন জ্বলে ওঠে হৃদয়; এবং ধীরে ধীরে কবিতা জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়।”[১]

এই যে ‘মৃদুতম সচেতন অনুনয়’ এর কথা কবি বললেন তা নিবিড় একটি স্পর্শের মতো গভীর লাবণ্যের জ্যোতিতে স্নিগ্ধ হয়ে জেগে থাকে। বাইরের কোলাহল ও বাচালতা এ অনুনয়কে ছিঁড়ে দেয়। জীবনানন্দের কবিতায় আমরা দেখতে পাই সময়ের জ্বরে আক্রান্ত একটি ব্যথাতুর গুঞ্জন কীভাবে অজস্র রঙ আর দ্যুতি, দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের আস্বাদে ভরিয়ে দিয়েছে বাংলা কবিতার বেশবাস। সংস্কারকে ছিঁড়ে ফেলে সংস্কৃতির রাস্তায় তার চলাচল। ফলতই সত্তার বহুমাত্রিক বিকিরণ সম্ভব হয়। কবি অগ্রসর হন পরিণতির বিশেষ ভূমির দিকে। সংঘাত আর পীড়ন সত্তাকে নিয়ে যায় আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিজ্ঞার দিকে।

একদিকে জায়মান সময়ের সত্য অন্যদিকে অস্তিত্বের ধ্বস - এ দুয়ের প্রক্ষোভে এক কবি প্রতিনিয়ত সত্তাকে বিয়োজন করছেন। অস্তিত্বের রেখায়, সত্তার স্তরে জীবনের যে তুমুল আগুন অদৃশ্যভাবে একজন কবির হয়ে ওঠাকে নির্ধারণ করছে জীবনানন্দ দাশ এ থেকে রেহাই পাননি। দেশ ও কালের খণ্ডিত রূপ থেকেই একজন কবি ভেতরের উৎসকে অপরিসীম লাবণ্য দিতে চাইছেন কিন্তু অনির্দেশ্য কোনো আঘাতে সেই উৎস ঠিকমতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে না। কবি অন্বেষণ করছেন চৈতন্যের বিশুদ্ধ ভূমিটিকে কিন্তু সমাজ ও জীবনে এমনই এক অচলায়তন তৈরি হয়েছে যা থেকে উত্তরিত হওয়া সংবেদনশীল সত্তার পক্ষে দুঃসাধ্য এবং তখনই জন্ম হয় দ্বন্দ্বের। নিরলস আত্মখননের পর বিষ মন্থন করে যা উঠে আসে তা যাপনের ক্ষয় থেকে জাত এমন এক বোধ যা কবিকে কোনোভাবেই তৃপ্ত থাকতে দেয় না। এই অন্তর্মুখী অভিযাত্রায় বারে বারে নিজের পরিচয়কে প্রতিস্থাপিত করতে চান বৃহত্তম সামাজিক পরিমণ্ডলে। কিন্তু সেখানেও আত্মীকরণের কোনো ধ্রুব বিন্দু নেই, প্রতিমুহূর্তে পালটানো সময়স্বভাবে নিষিক্ত হয়ে সামাজিক অভিজ্ঞানও দুমড়ে মুচড়ে পড়ে। গ্রহণের আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তে তাই বর্জনের চোরাটান এসে দুলিয়ে দিয়ে যায় চৈতন্যকে। জীবনের তাৎপর্য তখন বদলে যায় নেতিবাচক অভীপ্সায়। একজন কবি শুষে নিচ্ছেন এইসব ক্লেদ, তমসা, আদিম কুহেলিকা। যে জীবনে শুধুই আত্মরতির উদ্‌গার, শুধুই স্বেচ্ছাবৃত সুখ সন্ধান, বস্তুগত তৃপ্তির পেছনে ছোটা সেখানে সত্যদ্রষ্টা কবির মনে সংগতির সূত্র সন্ধান বারবার ছিঁড়ে যায়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 97 - 105
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কবি তখন নিজের ভেতরেই আলো ফেলেন। সত্তার চিত্রল বলয়ে বিপন্ন মনের ধূসর ছায়া পড়ে। তবুও সমস্ত সামাজিক বিপর্যাস এবং সময়ের অন্ধ চলাচলের মধ্যে কবিসত্তা স্থির কোনো অভিভবের দিকে অগ্রসর হতে চায়। এই পরিব্রাজনের পথে বিষাদ আর বেদনা তীক্ষ্ণ হয়ে বেজেছে। তিনি বুঝেছেন অতীতের ভেতরে যে পূর্ণতা আর তৃপ্তি ছিল, সৌন্দর্যকে অন্বেষণের যে আকুলতা ছিল এখন সেই সন্ধান আর নেই। কারন এখন জীবন অনেক বেশি অন্ধকারের ঢেউ দিয়ে গড়া, মানুষের চাহিদা অনেক বেশি গভীর। বস্তুর বহুবিস্তারী চমকে ক্ষতবিক্ষত হয় আটপৌরে সৌন্দর্য ও সুষমাগুলি। দ্বন্দ্বময় এই মানসিকতার কারণেই সংবেদনশীল মানুষ সত্তার ভেতরে এক আশ্চর্য সংকট ও অনটন টের পায়। তখন প্রকৃতির কাছে আশ্রয় পেতে চায় মানুষ। প্রকৃতির মেদুর আর রূপময় লাবণ্যে ভিজিয়ে দিতে চান অন্তরকে -

“দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দুবেলা”
‘মৃত্যুর আগে’, ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’

কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলেন প্রকৃতিকে ঘিরে যে কল্পনা, স্বান্তনা বা তার রহস্য চৈতন্যকে নব পরিসরে জাগিয়ে দিতে পারত তা এখন আর সম্ভব নয়। বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে অনেক অন্তর্ঘাত, জখম, রক্তপাত লড়াই মানুষের মধ্যে দেখার যে সহজিয়া প্রাণময় প্রকাশ ছিল তাকে মুছে দিয়েছে। এখন রক্ত আর আঁধারে মেশা বিরাট অট্টহাস যেন মৃতের শীতলতা নিয়ে স্ফীত হয়ে উঠতে চায়। মৃত মাছের চোখে মিশে আছে যে কালো শ্যাওলার আস্তরণ তা ছাপোষা মধ্যবিত্তের কনীনিকাতেও আটকে আছে। তাকে সরিয়ে প্রাকৃতিক নিরালা রূপটানে সিক্ত হওয়ার পিপাসা আজ মরে গেছে। গূঢ় প্রকৃতিচেতনাতেও কবি ডুবে গিয়েছেন কিন্তু ডুবে যাওয়ার মুহূর্তেই পিঙ্গল চামড়ার ভেতর থেকে ফুটে উঠেছে দগ্ধ রক্তবিন্দু। সেই সমর্পণ, সেই আশ্বাস নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়ার সুতীব্র আকুলতা অনুভবের ভিন্ন প্রতিবেশ নিয়ে দ্যোতিত হয়ে ওঠে –

“আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই- নুয়ে আছে নদীর এপারে
বিয়োবার দেরি নাই- রূপ ঝরে পড়ে তার
শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে তার।”
‘অবসরের গান’, ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’

জীবনানন্দ লক্ষ্য করেছিলেন প্রকৃতির স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কেননা মানুষ স্বাভাবিক নেই। তার মননের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘূণ পোকা। প্রকৃতির অভ্যন্তরে যে কাঁপন তাকে সজীব আর সচল করে, যে স্পন্দনের ভেতরে আছে মৃত্যুহীন এক অঙ্গীকার সেই সংযোগ ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ফলে প্রকৃতিকে আর তেমন করে পাবার উপায় নেই। প্রকৃতির মধ্যে চারিত হয়ে থাকা জীবন তার প্রভূত তেজ নিয়ে বিকিরণ করছে না। প্রকৃতি তাই পটভূমি, বীজক্ষেত। জন্ম ও মৃত্যুর যাতায়াতে প্রকৃতি মানবকে লালনের অনিবার্য আশ্রয়ভূমি। সৌন্দর্যবোধের সেই পুলক আর আত্মতন্ময় শিহরণ নয় বরং প্রকৃতি গড়ে তুলেছে পরম্পরা, বস্তু পৃথিবীর শিরা ও শিকড় ভেদ করে কোনো রহস্যময়ী আলোর পরিবর্তে সামাজিক উত্তরণের জিজ্ঞাসাগুলি প্রধান হয়ে উঠল। প্রকৃতি হয়ে উঠল গভীর অস্তিত্ব সংকট এবং অবচেতনার গূঢ় রহস্যকে প্রতিফলিত করার ভাষা। অবর্ণনীয় জটিল সংকেত মনস্তত্ত্বের ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ধূপছায়া মেখে অশরীরী দিব্যতায় প্রস্ফুটিত -

“আকাশের বিরামহীন বিস্তীর্ণ ডানার ভেতর
পৃথবী কীটের মতো মুছে গিয়েছে কাল
আর উত্তুঙ্গ বাতাস এসেছে আকাশের বুক থেকে নেমে
আমার জানলার ভিতর দিয়ে সাঁইসাঁই করে,
সিংহের হুঙ্কারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরে অজস্র জেব্রার মতো”

-- 'হাওয়ার রাত', 'বনলতা সেন'

প্রতিনিয়ত মানুষের হাতে স্থূলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে যে পৃথিবী, বাস্তবকে নিষ্পেষণ করে তাকে নীরক্ত করে দেওয়ার মধ্যে যে পৃথুল সুখ ফেনায়িত হয়ে উঠেছে সেখানে প্রকৃতিকে নতুন করে পাওয়ার মতো কিছুই নেই। কেননা সবকিছুই মোটা দাগের, আহার নিদ্রা মৈথুন সর্বস্ব পৃথিবীতে শত শত শূকরীর প্রসব বেদনার আড়ম্বরই এখানে প্রধান। যাপনের এই শুষ্কতা, গ্লানি থেকে অতিক্রমণের জন্যই আরও কোনো গভীর দহনে নীল হওয়া প্রয়োজন; বাইরে থেকে অদ্ভুত এক ঝলক এসে বিব্রত ও বিপর্যস্ত করে দেবে অলস স্তরগুলি। জীবনের এই স্থির কেন্দ্র মুছে দিয়ে সত্তাকে যে দেবে তছনছ ও ঘূর্ণি তা এই প্রকৃতি। কেননা 'মানুষের লালসার শেষ নেই', 'অবৈধ সঙ্গম ছাড়া সুখ নেই'। যারা অন্ধ তারাই বেশি দ্যাখে। চারদিকে ভিড় করে আছে বিকলাঙ্গ, অন্ধ বধিরের দল। আত্মসর্বস্ব এই দুনিয়ায় কি সত্যিই মুক্তি সম্ভব? ঘূণ ধরা সামাজিক কাঠামোতে তাই নিরন্তর চোরাবালির হাতছানি। সুস্থ চিত্তে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে উপভোগ করা সম্ভব নয়। এজন্য চাই পরাবাস্তবতার প্রখর নির্মিতি। কৃষ্ণচূড়ার গায়ে নখ আচড়ানো শাদা রহস্যময় বেড়াল খুঁটিয়ে তুলবে চামড়ার সফেন পলেস্তারা। স্বপ্নময় অস্তিত্বের সঙ্গে এভাবেই জাগ্রত জগতের মেলবন্ধন ঘটবে, আঘাত করবে অনড় ব্যক্তিত্বের মূল ধাতুতে। দ্বন্দ্বের মাঝেই জাগবে অস্তিত্বের উত্তরণ। অস্তিত্ব ছড়িয়ে যাবে অতীতের বিবর থেকে উদ্ভিদ জগৎ বা প্রাণী জগতের মায়াজালে, সত্তা বিকিরিত হবে আলো-ছায়াময় রহস্যের প্রাচীন গোপন উপকূলে। বিচ্ছেদের খুব গূঢ় অথচ রেখাময় স্বর, অতৃপ্তির নীলাভ পরতগুলি গভীর ইন্দ্রিয় অনুভূতির সঙ্গে মিশে অভূতপূর্ব এক ইন্দ্রজালের ব্যঞ্জনা দিয়েছে যেন অপরিসীম ধাঁধার ভেতর দিয়ে সঞ্চারিত হচ্ছে নিজেরই আত্মসন্ধান, নিজেকে জাগানোর প্রক্রিয়া -

"রাত্রির সংকেতে নদী যতদূর ভেসে যায়- আপনার অভিজ্ঞান নিয়ে
আমারো নৌকার বাতি জ্বলে
মনে হয় এইখানে লোকশ্রুত আমলকী পেয়ে গেছি
আমার নিবিষ্ট করতলে"

'একটি কবিতা', 'সাতটি তারার তিমির'

বাস্তবতার বিভিন্ন মাত্রার মধ্যে যে অনৈক্য যে উচাটন তার মধ্যে ক্রিয়াশীল আন্তঃসম্পর্কের সংঘর্ষ। সার্বভৌম শূন্যতা তখন আদিম মুকুট খসিয়ে নাড়ির ঘ্রাণে দিব্য ও দ্যোতমানা। আত্ম আবিষ্কারের নেশায় তখন গভীরতর সুপ্তির ভেতরেই চলে বুনো তরঙ্গকে পাবার আয়োজন। তাই তমসার অভিজ্ঞানই সত্তার উৎকর্ষ চেনায়। কেননা -

> "বিষণ্ণ হেমন্তের যে অন্ধকারে প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের এবং সভ্যতার তৎকালীন নিরাশ্বাস উদ্যমহীনতার ছায়া, সে-অন্ধকারে সচেতন ব্যক্তি আত্মসম্বিত অর্জনের যে সুযোগই নিক, তার বিষণ্ণতায় কোনো সন্দেহ নেই। এ অন্ধকারে নক্ষত্রই একমাত্র আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথের সূর্যের আলোকে যে অনাহত সৌন্দর্যচেতনা পরম প্রত্যয়ের সঙ্গে বিকীর্ণ হয়েছে, আলোছায়ার বিচিত্র আলপনা এঁকেছে, জীবনান্দীয় জগতে সে প্রত্যয় নেই – থাকার কথাও নেই। অন্ধকার সেখানে সমাসন্ন, কুয়াশায় কম্পমান নক্ষত্রটুকুই সেখানে ভরসা।"[২]

অন্ধকারের এই আয়োজন সার্থক হয়ে উঠেছে চিত্রকল্পের আশ্চর্য মায়া দিয়ে। আদিম রাত্রির ঘ্রাণ, মরা মানুষের শাদা হাড়ের মতো আন্দোলিত গাছের প্রশাখা, হরিতকী গাছের হেমন্তের রাঙা ও গোল সূর্য, পিপুল গাছে বসে থাকা পেঁচা, নীল ভোর, জ্যোৎস্নায় ঝকঝক করে ওঠা নীল ডিম, সুপক্ক রাত্রির গন্ধ, প্রবাল পিঞ্জর ঘিরে ডানার উল্লাস, হেলিওট্রোপের মতো দুপুরের অসীম আকাশ ইত্যাদি চিত্রকল্পে কবি স্পর্শ করেছেন প্রকৃতিকে, সময়কে এমনকি চৈতন্যের সূক্ষ্ম তরঙ্গকে -

"মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে
প্রস্তর যুগের ঘোড়া যেন – এখনও ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর পরে
আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায়,

বিষণ্ণ খড়ের শব্দ ঝরে ইস্পাতের কলে
চায়ের পেয়ালা কটা বেড়াল ছানার মতো- ঘুমে ঘেয়ো কুকুরের অস্পষ্ট কবলে
হিম হয়ে নড়ে গেল ও পাশের পাইস রেস্তোরাতে
প্যারাফিন লণ্ঠন নিভে গেল গোল আস্তাবলে
সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে;
এইসব ঘোড়াদের নিওলিথ-স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে”
'ঘোড়া', 'সাতটি তারার তিমির'

এ যেন এক রূপকথার বাস্তব, সম্মোহন আর জাদু দিয়ে গড়া রূপালি পাটাতনের ওপর রচনা করছে আঁকাবাঁকা অপরিচয়ের নকশা। জ্যোৎস্নার উৎসবে ঘন হয়ে উঠেছে শান্ত নির্জনতা। বাস্তবের দ্বন্দ্বময় উত্থানের বাইরে অন্তরের হীরক স্তব্ধতার আরক। নির্মিত হল পশুপক্ষী প্রাণীদের নিয়ে ভিন্ন এক জগৎ। শেয়াল-শকুন-ঘোড়া-সিংহ-উট-তিমি-সিন্ধুসারস-বুনোহাঁস-তিতির-হাঙর-অক্টোপাস প্রভৃতি প্রাণীদের নিয়ে এই জগৎ অস্তিত্বের আরেকটি দিককেই উদ্ভাসিত করে তুলল। শুধু প্রাণীদের তুলে আনা নয় তাদের উল্লেখে প্রকটিত হল মানব পরম্পরার, সময়সচেতনার বিশেষ দিক হিসেবে। যা আমাদের স্বস্তি ও সন্তোষ, তৃপ্তি আর প্রাপ্তির বাইরে জন্ম-মৃত্যু, কামনা-বাসনা, মনোজগতের অবচেতন রঙ রূপে যা দেদীপ্যমান। ঘোড়া তখন হয়ে ওঠে মনোগহনের আলো আঁধারির উৎসার কিংবা সময়চেতনার জ্বলন্ত শিখা। ইহজগতের জ্যান্তব বহমানতায় ঘোড়ার প্রতীকে মানুষের সংবৃত আত্মার পদধ্বনি ও পরিক্রমণের সংলাপ যেন রচিত হয়ে চলল নিওলিথ স্তব্ধতাকে ছুঁয়ে।

এই দ্বন্দ্ব কখনো মানবমনকে বিক্ষত করে ভিন্ন প্রশ্নে। অস্তিত্বের সংশয়ই তখন অবারিত হয়ে দাঁড়ায়। প্রখর শূন্যতাবোধে চালিত হয়ে কবি মন উদ্বেগে অধীর হয়। এই অন্তর্গত শূন্যতাবোধকে অতিক্রম করা কখনো অসম্ভব হয়ে পড়ে। অভাবে যেমন শরীর জীর্ণ হয় তেমনি অতিপ্রাপ্তিতেও মন বিবর্ণ হয়ে পড়ে। যেমন 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি সব সফলতা প্রাপ্তির পরে মানুষের অসহায় বিচ্ছিন্নতা বোধ। ফাল্গুনের রাত। পঞ্চমীর চাঁদ ডুবে গেছে। বধূ আর শিশুর পাশে ঘুমোচ্ছে স্বামী অথবা পিতা। প্রেম, আশা কিংবা সুখ কোনোটিরই অভাব ছিল না তার। স্ত্রীর ভালোবাসা থেকেও বঞ্চিত নয় সে। অথচ 'আট বছর আগেকার একদিন' কবিতার নায়ক মৃত্যুকে বেছে নিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকা বলেছিল 'এ জীবন লইয়া কি করিব?' 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র শশীরও জীবন সম্পর্কে বিতৃষ্ণা জেগেছিল। সাময়িক চাওয়া পাওয়ার অভাব নয় আরও বড় আর গভীর সমস্যাতে ভুগছিল ব্যক্তিটি। ভেতরে উথলে ওঠা এই বোবা আর্তনাদকে সে চাপা দিতে পারেনি। সংগুপ্ত আর অন্তর্শায়ী সে আঘাত এতটাই প্রবল যে তা আত্মঘাতেরই নামান্তর হয়ে ওঠে। অথচ এই আঘাত বাইরে থেকে আরোপিত নয়, এই প্রক্ষোভ ব্যক্তিটির অন্তর্গত রক্তের। জীবন সম্পর্কে সে এমন এক মৌলিক জিজ্ঞাসায় কাতর যার উত্তর সে খুঁজে পায়নি। কারণ কোনো অর্থের অভাব, কোনো সাংসারিক পীড়ন, অতৃপ্তি বা অপ্রাপ্তি তার ছিল না -

“কোনো
নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই
বিবাহিত জীবনের স্বাদ
কোথাও রাখেনি কোনো খাদ
সময়ের উদ্বর্তনে উঠে এসে বধূ
মধু – আর মননের মধু
দিয়েছে জানিতে”
'আট বছর আগের একদিন', 'মহাপৃথিবী'

এছাড়া জীবনের বৃহত্তর সমস্যাটিও তার ছিল না -

“হাড় হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 97 - 105
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এ জীবন কোনোদিন কেঁপে ওঠে নাই”

'আট বছর আগের একদিন', 'মহাপৃথিবী'

সাধারণ মানুষের যা যা দরকার কোনো কিছুরই খামতি ছিল না। বরং যা ছিল বেশিই ছিল।

“তবুও সে তৃপ্তি পায় নি-
তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে”

'আটবছর আগের একদিন', 'মহাপৃথিবী'

'তাই' নামক অব্যয়টিই বদলে দেয় কবিতাটিকে। বদলে দেয় জীবনের মানেকেও। মনোগহ্বনের রহস্য যে কত ব্যাপক আর বিচিত্র হতে পারে তা সাধারণ আটপৌরে যাপনের মধ্যেও খুলে দিতে পারে তার বর্ণিল ঝাঁপি। সবকিছু থাকা সত্তেও সে কেন আত্মহত্যা করল? অপরিসীম আত্মঘাতী ক্লান্তি যেন পাঠককেও বিপর্যস্ত করে দেয়। বিদ্রুপ আর শ্লেষের ঝাঁঝ নিয়ে উঠে আসা এক চোরা চমকে সৃজনশীল মন আহত হয়। বোধহীন মানুষদের জীবন সম্পর্কে কোনো অভিমান হয় না বলেই তারা বোবা থাকতে পারে। আড়ম্বর আর সুখের সস্তা বিলাসে তাদের সুখী চামড়া আরও চিকন হয়ে ওঠে। স্তব্ধতার যে ঐশ্বর্য রয়েছে তার স্বাদ পেলে বিমূঢ় হতে পারে মানুষ। এই 'বিপন্ন বিস্ময়ে' দগ্ধ হয়েছিল যুবকটি। অনুভূতিহীন কেরিয়ার স্বর্বস্ব মানুষ এই 'বিপন্ন বিস্ময়ে' বিচ্ছুরিত হয় না। কেননা 'বিপন্ন বিস্ময়' সকলের জন্য নয়। কোনো সংবেদনশীল সত্তার কাছে -

> “জীবন তার অর্থ, তার চরিতার্থতা হারায়, মানুষ যখন নিজের জীবনকে ভারবাহী জন্তুর মতো টেনে নিয়ে চলে নিছক - সেই জীবন তো মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ। এমন অবাঞ্ছিত জীবনের থেকে পরিত্রাণ পেতে সে আত্মহত্যা করতে পারে, অথবা এর চেয়েও সূক্ষ্ম এর চেয়েও গভীর কিছু দ্বন্দ্ব জটিলতা থাকতে পারে 'আনপ্রেডিকটেবল' মানুষের সাদায় কালোয় বিভাজিত এই ভাবনাবর্গের বাইরেও কিছু ধূসর ক্ষেত্র থেকে যেতে পারে, কেতাবি ক্ষেত্রসমীক্ষণের বাঁধা ধারণা যার খোঁজই পায় না।”[৩]

জীবনের চেনা পরিচিত ছক থেকে সরে দাঁড়ালেই জীবন সম্পর্কে বীতস্পৃহা সঞ্চারিত হয়। উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধ ভৌতিক আহ্বান তখন শুনতে পায়। সাজানো সংসারে যে ভ্রম যে চ্যুতি, যে অনর্থক অহরহ ইঁদুড়দৌড় তার থেকে পালাতেই যেন মৃত্যুর শান্ত শিখাতে আশ্রয়। তবে কবি এই বিসর্জনের জয় ঘোষণা করেননি। অনেকেই এ কবিতাকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনেরই জয়গান বলে মনে করেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় এ মৃত্যু আসলে বীরত্বেরই ভিন্ন অঙ্গীকার। পশুর মতো বেঁচে থাকাকে যা প্রত্যাঘাত করে। একজন সংবেদনশীল মানুষ নিজের জীবনের বিনিময়ে প্রমাণ করে গেলেন বেঁচে থাকার আসল সত্য কী? এই বিসর্জন তাই বিচ্যুতি নয় বরং বিবেককে জাগানোরই যেন প্রকৃষ্ট উপায়। আত্মহননের মধ্য দিয়ে আত্মউন্মোচন, আত্মধ্বংসের ভেতর দিয়ে সার্বভৌম চৈতন্যকে জাগানোর প্রয়াস। এক দ্বন্দ্বের নিরসনে বহু দ্বন্দ্বের মিলন।

নারীকে ঘিরেও কবির চিরন্তন দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব কখনো জৈবিক স্থূলতায় সংবেদনশীল সত্তাকে না মানানোর প্রশ্নে, কখনো অদ্ভুত প্রত্যাঘাত জনিত বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে। নারীর প্রতি পুরুষের টান এবং পুরুষের প্রতি নারীর আকর্ষণ কখনোই নিঃশেষ হবার নয়। পুরুষ যেমন যুগযুগ ধরে তার প্রেমতৃষ্ণা নিয়ে নারীর কাছে কাছে এসে দাঁড়ায় তেমনি নারীও তার সত্তার পূর্ণ প্রকাশের লক্ষ্যে আপন সুষমার বিকাশের জন্য পুরুষের কাছে নিজেকে নিবেদন করে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু জটিলতা সৃষ্টি হয় তখনই যখন সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক নানা সমস্যা এই সংকটের ভেতর চাপ সৃষ্টি করে। নারীও তখন নিষ্ঠুরতার প্রতীক হয়ে ওঠে। জীবনানন্দের কবিতায় নারীর এই নীরস শুষ্ক রূপটি ঘিরে দ্বন্দ্ববোধ প্রখর হয়ে ওঠে। কবি নারীর কাছে পৌঁছাতে চাইছেন নারীকে যুগযুগ ধরে যেভাবে আঁকা হয়েছে সেভাবেই। আত্মের ভেতর বেড়ে ওঠা ক্ষোভ ও জুগুপ্সার প্রশমন করার জন্য কবি নারীর চিরন্তন সৌন্দর্য প্রতিমার তলে এসে দাঁড়াতে চান। আর বিরোধ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 97 - 105
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাঁধে এখানেই। কবির চাওয়ার মধ্যে যে শুদ্ধ আকাঙ্খার প্রকাশ, নারীকে ঘিরে শুদ্ধতার বিকাশ যুগের স্বেচ্ছাচার ঐ শুদ্ধতাকেই দাহ করে দিচ্ছে। কবি পেতে চেয়েছেন নারীর ভেতরে মানবের নিষ্কলুষ উত্থানকে। শিল্পীসত্তা বারে বারে নারীর মাধুর্যের কাছে, স্নিগ্ধতার কাছে অবনত হতে চেয়েছে, কিন্তু কবি যা চাইছেন তা পাচ্ছেন না। ফলতই এক ধরনের বিরোধের সৃষ্টি হচ্ছে -

"ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে
অবহেলা করে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে
ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে
আমারে সে ভালোবাসিয়াছে
আসিয়াছে কাছে,
উপেক্ষা সে করেছে আমারে,
ঘৃণা করে চলে গেছে যখন ডেকেছি বারে বারে
ভালোবেসে তারে।"

'বোধ', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'

লক্ষ্যণীয় 'মেয়েমানুষ' শব্দবন্ধটি। নারী নয়, মেয়ে নয় প্রেমিকা নয় 'মেয়েমানুষ'। ঘৃণা, উপহাস, ক্রোধ সমস্ত কিছু পুঞ্জীভূত হয়ে আছে ঐ শব্দবন্ধে। নারী সম্পর্কে, প্রেম সম্পর্কে জীবনানন্দের এই দ্বিধা ও ক্ষোভ কতটা তাঁর ব্যক্তিজীবন থেকে উৎসারিত তার ভূমিকাও নিশ্চয়ই আছে তবে এই অতৃপ্তির বোধ শুধু ব্যক্তিজীবন থেকে নয় তা সময়ের ক্রান্তিপিঠে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ভঙ্গি থেকেও উৎসারিত। নারীর সৌন্দর্য যেমন সত্য তেমনি সত্য এই সৌন্দর্যের আড়ালে কুশ্রীতাটুকুও। কবি পেতে চাইছেন ওই মধুর স্পর্শ, তাঁর স্বপ্নে আকাঙ্খায় কল্পনায় নারীর রূপের প্রতি বার্তা ফুটে উঠেছে অথচ বাস্তবে অন্যরূপ। পেমের প্রতিদানে পাচ্ছেন ঘৃণা, আশ্রয়ের পরিবর্তে উপেক্ষা, শান্তির পরিবর্তে হঠকারিতা। এবং তখনই মনে হচ্ছে 'এই ভালোবাসা ধুলা আর কাদা'। আবার প্রেমের চিরন্তন প্রতিমাটিও একেবারে মন থেকে মুছতে পারেন না - "আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে" (নির্জন স্বাক্ষর, ধূসর পাণ্ডুলিপি)। এই নিরন্তর দ্বন্দ্বে কবি ক্ষতবিক্ষত। বাইরের ভিড়, হুল্লোড়, হট্টগোল, হিসাব, কারবার, ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি হৃদয়কে নির্জীব করে তোলে। তাই "কোনো এক মানুষের মনে/ কোনো এক মানুষের তরে/ যে জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে" (নির্জন স্বাক্ষর) তাকে পাওয়া বড়ই অনিশ্চিত। কেননা 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন'। (সুচেতনা, বনলতা সেন) এখন আর সম্ভব নয় ধ্রুব আশ্বাসে ভর করে কোনো কিছু গড়ে তোলা তাই শনি শেয়াল ভাঁড় ধূর্তদের পৃথিবীতে নারী আজ মহিলা। ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের সূত্র ধরে যে নারী যুগযুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এসেছে কল্পনা মানসীর উৎসরূপে সেই 'মানুষী'র প্রেমের কোনো আবেদন আজকের যুবক কবিদের মনে কোনো সাড়া ফেলতে পারে না, তারা নিছকই মহিলা। সে মহিলার জঙ্ঘা দেখে কর্পোরেট পৃথিবী হো হো করে হেসে ওঠে। তার ভেতরে প্রেমের প্রেরণা নেই, আলোও নেই। যুবক কবিরা সুন্দরীদের উদ্দেশ্যে কবিতা লিখলেও সুন্দরীদের মনে তার কোনো প্রভাবই পড়ে না -

"একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে- একবার বেদনার পানে
অনেক কবিতা লিখে চলে গেলো যুবকের দল;
পৃথিবীর পথে পথে সুন্দরীরা মূর্খ সসম্মানে
শুনিল আরেক কথা – এইসব বধির নিশ্চল
সোনার পিত্তল মূর্তি তবু আহা, ইহাদেরই কানে
অনেক ঐশ্বর্য ঢেলে চলে গেল যুবকের দল
একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে – একবার বেদনার পানে।"

'ইহাদেরি কানে', 'মহাপৃথিবী'

একদিকে আছে প্রেমিক কবি শিল্পীর দল অন্যদিকে আহার নিদ্রা মৈথুন সর্বস্ব মহিলা। যে মহিলা নিজের প্রেমকে চিনতে পারেনি। এই সুন্দরীরা কবি শিল্পীদের নিয়ে প্রীত নয় বরং প্রীত বাস্তবের অনুসরণকারী যুবকদের প্রতি। এক্ষেত্রে মনে দ্বন্দ্ব এসেছে কিন্তু গভীর সত্য তাঁকে আগুনের মুখোমুখি করেছে। আবহমান নারীর এমন পরিণতি দেখে কবি আহত হচ্ছেন, বেদনার্ত হচ্ছেন। তাঁর অন্তঃকরণ চাইছে না পৃথিবীর রূঢ় সফলতার মুখ দেখতে। জীবনানন্দের কবিসত্তা কখনো দ্বন্দ্বে তীব্র হয়ে উঠছে, কখনো জিজ্ঞাসায় আকুল হচ্ছে, কখনো বেদনায় ছিন্নভিন্ন হয়ে উঠছে।

এই দ্বন্দ্ব এই উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তি পেতেই জীবনানন্দ তাঁর প্রেম চেতনাকে অন্যভাবে নির্মাণ করে নিলেন। যুগের অবক্ষয়তা, ক্লান্তি ধ্বসকে এগিয়ে গিয়ে কল্পনায় আশ্রয় নিলে বাস্তববোধহীন হবেন আবার রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হতে গিয়ে তাঁর অন্তঃকরণ একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে এ দুয়ের টেনশন থেকে মুক্তি পেতেই তিনি ভাবনাকে একেবারে নতুন করে গড়ে তুললেন। নারীকে কল্পনার আধার নয়, রোমান্টিকতার ম্যাড়মেড়ে ছায়া নয় আবার অস্থিমজ্জার নিরাভরণ উপস্থাপনও নয় তিনি খুঁজে নিলেন প্রকৃত শ্রেয়োবোধের মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রেমের গভীর গোপন আলোটিকে। কবি সেই বিশেষ নারীটিকে খুঁজে পেতে চান যার রূপের আড়ালে আছে জ্ঞান আর ধৈর্যের উদ্ভাস, আছে শান্তির দীপ। কিন্তু তা হয়তো বর্তমানের ক্লেদাক্ত রক্তাক্ত সময়ের পাদপিঠে দাঁড়িয়ে পাওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য চাই প্রকৃত প্রেমবোধের নিরন্তর অনুসন্ধান। এই সন্ধানই ফুটিয়ে তুলবে প্রকৃত প্রেমের জ্যোতি। যা নিভে গেছে তা আবার জ্বলে উঠবে যা পুড়ে গেছে তা আবার জাগবে। চাই প্রকৃত ধ্যান প্রকৃত দৃষ্টি। কবি তাই ইতিহাস অতীত ঐতিহ্য প্রকৃতি থেকে আহরণ করে নিলেন ধ্যানের মঞ্জরীটি যে প্রেম ক্ষত বিক্ষত হতে হতে ধ্বস্ত হয়ে ছিঁড়ে যায় নি বরং যন্ত্রণায় আলো ছড়িয়েছে। বহুযুগ আগেও নারীকে নিয়ে এরকমই স্থূলভাবে ব্যবহার করেছিল মোটাদাগের মানুষেরা; কিন্তু প্রেমের শুদ্ধতা তার আপন শক্তিতেই পথ খুঁজে পেয়েছিল। ক্লেদ বিকৃতি ক্ষয়ের মাঝেও অমেয় ছিল তার দীপ্তি। তখন কোথা থেকে পেয়েছিল প্রেম তার শক্তিকে? প্রকৃত প্রেমকে পাবার তাড়নাই হল প্রকৃত প্রেম যা যুগযুগ ধরে রয়ে যায় মানুষের মনে। এই অন্বেষণের অপর নাম হয়তো প্রেম। পৃথিবী সৃষ্টির আদি মুহূর্ত থেকেই চলছে এই অন্বেষণ, চলছে স্থবিরতা আর ভ্রান্তিকে ভেঙে নীড় গঠনের প্রচেষ্টা। কেউ পাচ্ছে কেউ পাচ্ছে না স্বপ্নের ঘর। প্রকৃত প্রেমিক সত্তা চিরকালই অবিরত সংগ্রামে রত, সংগ্রামে সংগ্রামে সন্ধান আরও সংহত হয়ে ওঠে –

> "অনেক সমুদ্র ঘুরে ক্ষয়ে অন্ধকারে
> দেখেছি মণিকা আলো হাতে নিয়ে তুমি
> সময়ের শতকের মৃত্যু হলে তবু
> দাঁড়িয়ে রয়েছ শ্রেয়তর বেলাভূমি"
>
> 'মিতভাষণ', 'বনলতা সেন'

ইতিহাস, প্রকৃতির মধ্যে যে স্থৈর্য যে ধীরতা আছে তাও গড়ে এই সুষমাকে। এবং এই অন্বেষণ থেকেই জগৎকে দেখার অভিমুখটি বদলে যায়। প্রকৃতি সেই পটভূমি যেখানে চৈতন্য সঞ্চয় করে নেয় অক্ষয় ধী, পবিত্রতা। বেদনায় ঝরে গিয়েও আবার জেগে উঠতে পারে। অখণ্ড বিশ্বের চলমানতার প্রতীক নারী সেই প্রাণের গতিতে নিজেকে অভিষিক্ত করে নেয়। যে কোনো একটি সময়পটে তাই এ উত্থানকে পাওয়া মুশকিল। আবহমান সময় পরিধির মধ্যে বিস্ময়ের ঘোর নিয়ে এ চেতনা মিশে আছে প্রকৃতির মধ্যে। ইতিহাসের প্রাচীন সুষমা, অতীতের উদার প্রেক্ষাপট, পাখপাখালি নদী শিশির বৃক্ষের শান্তিময় বাতাবরণে ক্ষণে ক্ষণে উঁকি দিচ্ছে শান্তির স্থির আভাস। বিকৃতির চোরাবালি বারে বারে তাকে ঢেকে দিতে চাইছে কিন্তু মানুষের শুভবোধ আর স্বপ্ন সে বালিকে সরিয়ে পুনরায় আবিষ্কার করছে ঐ গুঞ্জন। প্রকৃত প্রেমের খোঁজ না থাকলে আত্মানুসন্ধান হয় না। এই খোঁজ থাকলে তবেই তো নক্ষত্রের দীপ্তি একদিন আঁখিতে জ্বলে ওঠে। এই আহ্বানই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায় -

> "সব পাখি ঘরে আসে – সব নদী - ফুরায় এ জীবনের সব লেন দেন;
> থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।"

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 97 - 105
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

‘বনলতা সেন’, ‘বনলতা সেন’

ভাঁড়, মাতাল, বকধার্মিক, উঞ্ছবৃত্তিধারীরা বারবার নারীকে ভোগের পণ্য হিসেবে তৈরি করতে চেয়েছে, বাণিজ্যিক পৃথিবী তাকে ব্যবহার করেছে উন্নাসিকরা তাকে নিয়ে খেলেছে – এত সবের মাঝখানে নারীও তার সুষমা হারিয়েছে। এই সৌন্দর্য, বিশ্বাস আর প্রতিশ্রুতির লাবণ্যকে পেতে হলে আমাদের যেতেই হবে সুদূর অতীতে বা প্রকৃতির নির্জন সন্নিপাতে। বস্তুর নিবিড় পক্ষপাতিত্ব আর বহু ব্যবহারে ভোঁতা হয়ে গেছে সকল সূক্ষ্ম চেতনা। পার্থিব প্রীতির ভীড়ে তার শ্রী ঢেকে গেছে। প্রেম আর প্রজ্ঞার মিশেলে জ্বলে ওঠা আলোটি নিভে গেছে। আধুনিক ব্যস্ত পৃথিবী, সামাজিক সংকটের এই দিনে, আদর্শহীনতার এই সময়ে প্রাচীন অচেনা অনুভূতি কোথায়? সেই শুদ্ধ চেতনাকে পাওয়ার জন্য কবির সন্ধান চিরন্তন, সে আহ্বানের নিকট কবির অপেক্ষা শাশ্বত।

Reference:

১. দাশ, জীবনানন্দ, ‘কবিতার কথা’, কবিতার কথা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, পৃ. ৯

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, ‘সময় গ্রন্থির কবি জীবনানন্দ’, বাংলা কবিতার কালান্তর, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৫৭

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্ত, ‘অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে-আট বছর আগের একদিন’, আমার জীবনানন্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪১৫ পৃ. ৮৬